প্রথম আলো

তারিখ 17 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা দিবস ■ নুরুল ইসলাম নাহিদ

শিক্ষানীতির জন্য ছাত্রসমাজের সংগ্রামের ৫০ বছর

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের শিক্ষানীতির জন্য গৌরবময় সংগ্রামের অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হলো। ১৯৬২ সালের সেই গৌরবের দিনটি আমরা প্রতিবছর 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছি।

ষাটের দশকে আমাদের দেশের গৌরবময় ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষানীতি প্রতিরোধ করা এবং একটি গণমুখী, অগ্রসরমাণ, বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করা। ১৯৬২ সালে তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৬৪ সালে হামুদুর রহমান কমিশনের শিক্ষানীতি, ১৯৬৯ সালে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে শিক্ষানীতি—সবই তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের মুখে বাতিল করতে পাকিস্তানি সরকার বাধ্য হয়েছিল।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে আনলেও তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যার পর, তা আর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এরপর প্রায় তিন দশক ধরে পাঁচ-ছয়টি শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হলেও কোনোটির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে চলেছে। বাষট্টির গৌরবময় ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে আমি শিক্ষানীতির আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলাম। আজ অর্ধশতাব্দী পর সফল শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গেও আমি সরাসরি সম্পৃক্ত আছি। আজকের এই শিক্ষা দিবসে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেদিনের শহীদ বাবুল, মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহসহ শিক্ষা আন্দোলনের সব নেতা-কর্মীকে।

জাতীয় শিক্ষানীতি দু-এক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করার বিষয় নয়। ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, অনেকগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন। ২০১১ সালের মধ্যে সব শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ২০১৮ সালে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যেই ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অন্যটির জন্য বহু কার্যক্রম ও প্রস্তুতি চলছে।

অনেকে বলেন, শিক্ষানীতি তো বাস্তবায়িত হলো না। তাঁদের ধারণা, কোনো এক সরকারি ঘোষণায় এক দিনে সবকিছু বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি শিক্ষার্থী। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নিরক্ষর, বহু ধারার শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে শিক্ষায় সবচেয়ে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয় যেসব দেশে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। পুরোনো পদ্ধতি, পুরোনো পাঠ্যক্রম, পুরোনো ধ্যান-ধারণার অধিকাংশ শিক্ষক, সুযোগ-সুবিধার অভাব, বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাবানদের চাপ এবং তার ফলে যথাস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগদানে বাধা, এমনকি আইন ও বিধিমতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি করাও বড় বাধা ইত্যাদি হাজার সমস্যা কাটিয়ে ওঠা এবং একদিকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অন্যদিকে দক্ষ জনবল, দক্ষ শিক্ষক, দক্ষ পরিচালকসংকট ইত্যাদি তো সচেতন মহলের একেবারেই অজানা নয়।

এসব বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে সীমাবদ্ধ সম্পদের ব্যবহার করে আমাদের এগোতে হচ্ছে। অতীতের অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার কাজ শুরু থেকেই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের অনেক ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও বাধা রয়েছে, তা আমরা বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থেকে সংশোধন করে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

নিচে বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা খাতে অগ্রগতির কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো:

১. সব মত-পথ, শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে প্রচার, আলোচনা, সভা-সেমিনার, ওয়েবসাইটে মতামত, লিখিত মতামত গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রথম একটি জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

২. ২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশের বেশি শিশু স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। ঝরে পড়ার হার ৪৮ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে।

৩. আন্তর্জাতিকভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নির্ধারিত বছর ২০১৫ সাল। কিন্তু আমরা তার অনেক আগেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যাসমতা অর্জন করেছি এবং তা এখন স্থিতিশীল। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের সমতা অর্জন এখন সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আদর্শ (মডেল) দেশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৪. ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাখিল মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে ১ জানুয়ারি মোট ৬৫ কোটির অধিক পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর আগে শুধু প্রাথমিক স্তরে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হতো। তা-ও মার্চ-এপ্রিলের আগে সম্ভব হতো না। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারিতে নতুন পাঠক্রম (কারিকুলাম) অনুযায়ী লিখিত প্রায় ২৭ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

৫. বর্তমানে যেসব পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়, তা লেখা হয়েছে ১৬ বছর আগে। ইতিমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে প্রযুক্তির জগতে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেছে। এর প্রভাব আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নেই। আমরা পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। গত বছর নতুন পাঠক্রমে সাতটি নতুন বই দিয়েছি। ২০১৩ সালে আরও ৮৬টি নতুন পাঠক্রমের বই তুলে দেওয়ার কাজ চলছে।

৬. সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণী শেষে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসায় জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখা, সারা দেশে সমমান অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন আর ভিন্নভাবে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না। পরীক্ষার সংখ্যাও কমে গেছে।

৭. এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এগিয়ে এনে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রতিবছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু করা হয় ১ এপ্রিল। এসব পরীক্ষার ফলাফল ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশ করা এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু। ফলাফল ৩০ দিনের মধ্যে। প্রথম বছর মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফল প্রকাশ, পরে ইন্টারনেট, টেলিকনফারেন্স এবং এ বছর পেপারলেস অনলাইনে এসএসসি-এইচএসসির ফল প্রকাশিত হয়েছে।

৮. পাসের হার সারা দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ ১০টি শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও প্রতিবছর বেড়ে চলেছে।

৯। অনুরূপভাবে এ বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায়ও পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর হার লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে।

১০. সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও পরীক্ষার ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যেকোনো বিষয় যৌক্তিকভাবে বোঝা ও

উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীরে ধীরে একটি যুক্তিনির্ভর সমাজ তৈরি হচ্ছে।

১১. প্রায় ১২ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষক-প্রশিক্ষককে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

১২. স্কুলে ১ জানুয়ারি এবং কলেজে ১ জুলাই ক্লাস চালু করা সম্ভব হয়েছে। আগে ফেব্রুয়ারি-মার্চের আগে নিয়মিত ক্লাস শুরু হতো না।

১৩. প্রায় ৭৮ লাখ প্রাথমিক ও প্রায় ৪০ লাখ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। মেধা তালিকায় প্রায় ১ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে।

১৪. প্রাথমিক স্তরে ৮৭ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় দুই হাজার এবং স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নতুনভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১৫. ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় আট হাজার নতুন ভবনের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে অথবা চলছে। সরকারি উচ্চবিদ্যালয়গুলোতে দুই শিফট খোলা হয়েছে।

১৬. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। নতুন আরও আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পেয়ে চালু হয়ে গেছে।

১৭. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬টি গবেষণা উপপ্রকল্পে ১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। দেশের উচ্চশিক্ষা খাতের গবেষণায় এর আগে এত বেশি বরাদ্দ আর কখনো দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যাপক প্রচার, জনমত গড়ে তোলাসহ বহু বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীসংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯. ২০ হাজার ৫০০ স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু করার প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। তৈরি করা হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট।

২০. কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য ১৭টি মাইক্রোবাসে মোবাইল কম্পিউটার ল্যাব এক বছর ধরে দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে।

২১. শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, পরীক্ষার ফরম পূরণ প্রভৃতি কাজ এখন অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার যাবতীয় কাজ, নিয়োগ, মন্ত্রণালয়ের সব সিদ্ধান্ত, পরিপত্র, সার্কুলার, প্রজ্ঞাপন, বদলি, প্রমোশন, ছুটি, অবসরভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্ট এখন বেসরকারি শিক্ষকদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয় অনলাইনে মুহূর্তের মধ্যেই সবাই জানতে পারছেন।

২২. ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন বন্ধের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

২৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু প্রভৃতি বিষয়ে যেসব মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ করে সঠিক তথ্য ও ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

২৪. ভর্তি-বাণিজ্য, কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

২৫. মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধের জন্য সদা সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুরু থেকেই আমি বলে আসছি, জনগণের সীমিত সম্পদ দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। তাই এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করতে হবে, এ জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

৩২। প্রথম থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর তত্ত্বাবধানে বছরে দুবার স্কুল-মাদ্রাসা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। শারীরিক-মানসিক বিকাশের জন্য এটা জরুরি।

৩৩। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত নানা অনিয়ম, অসংগতি দূর করা এবং আরও উন্নত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য, বিশেষ করে শিক্ষানীতি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য 'নতুন শিক্ষা আইন' প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

এখানে সংক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের বিগত সাড়ে তিন বছরে শিক্ষা খাতে সাধিত কতিপয় অগ্রগতির বিষয় উল্লেখ করা হলো। সহজেই এ রকম তালিকা বহু গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ধরনের বহু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সবকিছুই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর বাস্তবায়ন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য এবং মৌলিক নীতিগুলো ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য ও নীতি বাস্তবতার ভিত্তিতে সৃজনশীলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটাই সঠিক পন্থা। শুধু স্লোগান দিয়ে নয়, এর ফলাফল দেখেই বিচার করতে হবে। এভাবেই শিক্ষা দিবসের লক্ষ্য ও তাৎপর্য অর্জন সম্ভব।

● নুরুল ইসলাম নাহিদ: শিক্ষামন্ত্রী।